Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 273 – 281
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

সৈকত রক্ষিতের উপন্যাসে বঞ্চিতা ত্রয়ী নারী

সারমিন সুলতানা
গবেষক
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : mail.mstsarmin@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Woman, Marginal, Jhumor, Impotent, Motherhood, Witch, Dancer, Patriarchal.

Abstract
Saikat Rakshit is one of the remarkable reformers of the new journey of changes that started in Bengali fiction from the seventies of the last century. Inspired by reading of Rabindranath's writings, in his school life, the dream of being a writer in future took root in the depth his heart. But when he starts studying Bengali literature, he finds that the literature of Purulia, his native district, is outcasted in Bengali literature. His creations have been expanded due to the inquiry about the lives of marginalized people in Purulia district inhabited by tribals. Saikat Rakshit, a portraitist of marginal public life, has depicted the lives of three marginal women in the novels 'Sindure Kajole', 'Dhula Udani' and 'Vaishampayan Kohilen'. Bhaduri Mahatan, the heroine of the novel 'Sindure Kajole', get neither taste of sexual happiness or motherhood in the family of her eunuch husband, Adalat Mahatan. To satisfy the primitive needs of people, she gets involved in an illicit relationship with Srikanth. Illegitimate children by Srikant - Bhav and Champi were born in her womb. But after Bhav got a little older, one day, he saw an intimate scene of sexual lust of his mother and Srikanth. Due to his childish protests by him, Bhaduri lost her consciousness and killed her son by strangling. But when she regained her consciousness, she starts burning with remorse for killing her son. Finally, Bhaduri has put on her burning sensation by sacrificing her life. The novel 'Dhula Udani' is a depiction of life of how a young woman becomes a dancer and becomes a commodity of misogynistic men living in the society and how she is slandered as 'witch' and engrossed into darkness due to the blind superstitions prevailed in the society. In the novel 'Vaishampayan Kohilen', novelist Swapnacharini has painted the life of a woman named Binota. In a patriarchal society, when a couple is unable to conceive children, society always looks down upon women, regardless of who is to be blamed for. Here, Binota has pointed out the true nature of such aspect of society. In fact, in these three novels, the novelists have revealed the psychological struggles of the three underprivileged women characters- their strong desire to taste motherhood and above all, heroic selfhood in the incomparable exquisite beauty of art.

Discussion

আত্মপ্রচার বিমুখ কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত চার দশকেরও বেশি সময় ধরে গল্প উপন্যাস লিখেছেন। বিগত শতাব্দীর সত্তর দশক থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে পালাবদলের যে নবযাত্রা শুরু হয়েছিল তার অন্যতম যাত্রী সৈকত রক্ষিত। সত্তরের দশকের বিশেষ একটি শ্লোগান ছিল গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে ফেলা। রাজনৈতিকভাবে এই স্লোগানের সফলতা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও বাংলা কথাসাহিত্যে গ্রামজীবন অর্থাৎ প্রান্তিক মানুষের জীবনযাত্রা বিস্তৃত জায়গা দখল করে। আর এই গ্রাম জীবনে প্রান্তিক মানুষের কথায় প্রস্ফুটিত হয়েছে সৈকত রক্ষিতের কথাসাহিত্যে। স্কুলজীবনে রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়তে পড়তে অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যতে লেখক হবার স্বপ্ন বাসা বাধে তার মনের গভীরে। জন্মসূত্রে তিনি পুরুলিয়ার সন্তান। কিন্তু বাংলা কথাসাহিত্য পড়তে এসে তিনি দেখলেন নিজের জেলার কথায় সাহিত্যে ব্রাত্য। স্থির করেন বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্গনে নিয়ে আসবেন আদিবাসী অধ্যুষিত পুরুলিয়া জেলার জীবনযাত্রা লোকসংস্কৃতি বিশ্বাস-অবিশ্বাস, অভাব-অনটন ইত্যাদির চিত্র। শুধুমাত্র গল্পের জন্য গল্প তিনি কখনও লেখেননি, সামাজিক দিক থেকে তার রচনাগুলি ঐতিহাসিক মূল্যের দাবিদার। উপন্যাসিক নিজেই স্বীকার করেছেন –

> "আমি লিখি মূলত 'সাবঅলটার্ন'দের নিয়ে। মফস্বল শহর, গ্রাম এবং গ্রামজীবন আমার লেখার উপজীব্য।[১]

এই উক্তির আলোকে আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না প্রান্তিক মানুষের জীবন জিজ্ঞাসার টানেই তার সৃষ্ট সম্ভার বিস্তার লাভ করেছে।

"Art for Art's Sake" এই মতবাদে বিশ্বাসী কথাসাহিত্যিক সৈকত রক্ষিত প্রচারের জন্য নয় ভালো শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সাহিত্য রচনা করে চলেছেন। বাজারদরের উপর ভিত্তি করে তিনি কখনও সাহিত্য রচনা করেননি। তিনি কিছুটা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলেছেন –

> "কোন সাপ্তাহিক, দৈনিক, মাসিক, ট্যাবলয়েড বা শারদ সংখ্যার কথা ভেবে নয়, আমি লিখি আমার খেয়ালে– আমার পরিব্রাজনময়-জীবনের ছন্দে ছন্দে কোন কোনো সম্পাদকের অর্ডার ধরার চক্রে আমি নেই। তাই দু-তিন বছরে দু-একটি গল্প উপন্যাসের বেশি আমার লেখা হয়ে ওঠে না। আমি তো সংখ্যায় বেশি লিখতে চায় না, লেখা ফেরি করে উপার্জন করারও প্রয়োজন আমার নেই।"[২]

কেবল মাত্র আন্তরিকতার তাগিদে ও বঞ্চিত অসহায় নিরন্ন মানুষের প্রতি ভালোবাসা থেকে সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে যে উপন্যাসগুলির জন্ম তিনি দিয়েছেন সেগুলির বাজার মূল্য যায় থাকুক না কেন, বর্তমানে পাঠকের গভীর আগ্রহের বিষয় হয়ে উঠেছে। তার উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল– 'আকরিক' (১৯৮৪), 'হাড়িক' (১৯৮৭), 'ধূলা উড়ানি' (১৯৯৬), 'অক্ষৌহিণী' (১৯৯৬), 'বৃংহন' (২০০০), 'সিরকাবাদ' (২০০১), 'কুশকরাত' (২০০১), 'সিঁদুরে কাজলে' (২০০২), 'ঢেঁকিকল' (২০০৩), 'মহামাস' (২০০৫), 'মদনভেরি' (২০০৮), 'স্তিমিত রণতূর্য' (২০১৪), 'বৈশম্পায়ন কহিলেন' (২০১৪) এবং 'জয়কাব্য' (২০১৫) ইত্যাদি।

পুরুলিয়ার মানবাজার-২ নম্বর ব্লকের সন্নিকটে খড়িদুয়ারা গ্রামের কুমারী নদীর উপকণ্ঠে আয়োজিত 'সৃজন উৎসব'কে কেন্দ্র করে সৈকত রক্ষিতের শিল্পীসত্তা বর্ধিত হয়েছে। তার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস 'আকরিক' (১৯৮৪)। এই উপন্যাসটি পাল্টে দিয়েছে লেখকদের জীবন দর্শন। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসিক বলেছেন–

> "সে সময় বাসে উঠলেই একটা লেখা চোখে পড়তো-৩০+১ কিংবা ৩৬+১। এখন ভাবতে অবাক লাগে, এই তুচ্ছ লেখাটি লেখক হিসেবে আমার জীবন-দর্শনকে পুরোপুরি পাল্টে দিল। আমার ভাবনা বা সংকল্পের মধ্যে যাবতীয় যা খাদ ছিল, তার সবই ধুয়ে মুছে দিয়ে আমাকে আত্মস্থ করে তুলল একটা লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। মনে হল, কেবল ভালো লেখা লিখলেই হবে না, আমাকে এমন লেখা লিখতে হবে, যা এই ৩৬ জনের ভিড়ে হারিয়ে যাবে না। আমাকে 'প্লাস ওয়ান' হতে হবে। এই সংকল্পে আজও আমি অনড় এবং অটল আছি।"[৩]

এই উপন্যাস থেকে লেখকের 'প্লাস ওয়ান' ভাবনা শুরু হয়েছে। উপন্যাসটি পুরুলিয়ার হতদরিদ্র সিমেন্ট ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের জীবন চিত্র। 'অক্ষৌহিণী' (১৯৯৬) উপন্যাসে রয়েছে ইটভাটার খাদিয়াদের জীবন সংগ্রামের আখ্যান। আখ চাষীদের নিয়ে লিখেছেন 'সিরকাবাদ' (২০০১)। পুরুলিয়ার জল সমস্যা কেন্দ্রিক উপন্যাস 'ঢেঁকিকল' (২০০৩)। শূকর

পালক সহিসদের জীবনকথা হলো 'হাড়িক' (১৯৮৭)। একই ভাবে 'ধূলা উড়ানি' (১৯৯৬), 'বৃংহন' (২০০০), 'সিরকাবাদ' (২০০১), 'সিঁদুরে কাজলে' (২০০২), 'মহামাস' (২০০৫), মদনভেরি (২০০৮) ইত্যাদি উপন্যাসে ঝুমুর নাচনী, কারিগর, শাঁখারি সম্প্রদায়ের জীবন চিত্র, তুলো সংগ্রাহকদের জীবনকথা, শূকর পালক, আদিম বাদ্যযন্ত্র বাদক ঘসিরা সম্প্রদায়ের কথা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে, এখনও মেয়েদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। পরিবারের সবচেয়ে কম অধিকার পান মেয়েরাই। বড় শহরে এই মানসিকতা কম দেখা গেলেও গ্রামে, মফঃস্বলে এই চিন্তাধারা এখনও বর্তমান। নারীদের এই ব্রাত্য জীবনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে 'ধূলা উড়ানি' (১৯৯৬), 'সিঁদুরে কাজলে' (২০০২), 'বৈশম্পায়ন কহিলেন' (২০১৪) এই তিনটি উপন্যাসে বঞ্চিতা ত্রয়ী নারী চরিত্রের মধ্য দিয়ে। সৈকত রক্ষিত মূলত নিম্নবর্গীয়, অবহেলিত, হতদরিদ্র, লাঞ্ছিত মানুষদের জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন উপন্যাসের পাতায়। কোন বাহ্যিক আকর্ষণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে তিনি কখনোই শিল্পের সঙ্গে আপোষ করেননি – আর এখানেই শিল্পী হিসেবে তার সার্থকতা।

সৈকত রক্ষিতের একটি জনপ্রিয় উপন্যাস 'সিঁদুরে কাজলে'। এই উপন্যাসটি ২০০২ সালে কলকাতা বইমেলায় প্রকাশিত হয়। পুরুলিয়া জেলার ঝুমুর সঙ্গীতের প্রসঙ্গকে নিয়ে এই উপন্যাসের কাহিনি বিস্তার লাভ করেছে। পুরুলিয়ার মানুষের কাছে 'ঝুমুর' এই তিন অক্ষরের ব্যঞ্জনা কতখানি তা এক কথায় বলা প্রায় অসম্ভব। ঝুমুর তাদের জীবন, রক্তস্রোত, হৃদয়ের হৃদস্পন্দন। সমাজ ও সংস্কৃতি, আচার-অনুষ্ঠান, অবসর-বিনোদন, প্রেম-বিরহ, আশা-নিরাশা, শিল্প সৃজন, ভাব বিনিময়, সংগ্রাম ও প্রতিবাদে ঝুমুরই তাদের অবলম্বন ও লোকমাধ্যম বলা যায়। উপন্যাসিক সৈকত রক্ষিত নিজে মূলত পুরুলিয়ার ভূমিপুত্র। সেই সুবাদেই পুরুলিয়ার জনজীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র তাঁর উপন্যাসের মধ্যে প্রস্ফুটিত হয়েছে। তিনি নিজে পুরুলিয়ার প্রান্তজনের জীবনকে দেখেছেন, অনুভব করেছেন এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সৃজন উৎসবের মাধ্যমে আত্মিকভাবে মিশেছেন বহু বিচিত্র মানুষের সঙ্গে। 'সিঁদুরে কাজলে' উপন্যাসে ঝুমুরের প্রসঙ্গ কাহিনির সঙ্গে বাস্তব ও জীবন্ত রূপে ফুটে উঠেছে। এই উপন্যাসটি যে পুরুলিয়ার জনজীবনের দলিল স্বরূপ একথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

'সিঁদুরে কাজলে' উপন্যাসটির তিনটি প্রধান চরিত্র – ভাদুরি মাহাতন, আদালত মাহাতন এবং শ্রীকান্ত রাজুয়ার। এই তিনজনকে কেন্দ্র করে কাহিনি যে পথে অগ্রসর হয়েছে তা নদীপথের মতো আঁকাবাঁকা ও জটিল। ছোটবেলা থেকেই ভাদুরি বাবা-মার আদরের সন্তান। মোটামুটি সচ্ছল পরিবারেই তার জন্ম। কিন্তু যেহেতু নারী হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছে তাই তাকে বিবাহ করে অন্যত্র চলে যেতে হবে এটাই আমাদের সভ্যতার নিয়ম। আদালতকে স্বামী হিসেবে বরণ করে ভাদুরিকে চলে আসতে হয়েছে কালুহার ছেড়ে মালথোড়। এরপর শুরু হয় ভাদুরির দাম্পত্য জীবন। কিন্তু অল্প দিনেই ভাদুরি টের পায় তার স্বামী আদালত নপুংসক। সারারাত ধরে চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভাদুরিকে যৌনসুখ দিতে পারেনি আদালত। ব্যর্থ হয়েছে পরিপূর্ণরূপে স্বামীর কর্তব্য পালনে। স্বাবাভিকভাবে প্রতিটি নারীর মতো ভাদুরি মা হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল, যা স্বামীর নপুংসতার কারণে ব্যর্থ হয়। আর এই অতৃপ্ত বাসনায় তার জীবনকে চালিত করেছে জটিল পথে। দাম্পত্য সুখহীন সংসারে নেমে আসে নিত্যদিনের অশান্তি। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও অশান্তির কারণে সে মাঝে মাঝে বাপের বাড়ি চলে যায়। কখনো দুই দিন বাদ ফিরে আসে, আবার কখনো চার দিন। এই ভাবে কাটতে থাকে তাদের সুখহীন দাম্পত্য জীবন। কিন্তু ভাদুড়ি এক পুরুষে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। মানুষের আদিম চাহিদা নিবারণে সে জড়িয়ে পড়েছে অবৈধ সম্পর্কে। শ্রীকান্তের বাঁশির সুরে ফুটিয়ে তোলা ভাদরিয়া ঝুমুরের সুরে ভাদুরি তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়ে। যারপরনাই শ্রীকান্তের জন্য তার হৃদয় আকুল হয়ে পড়ে। কারণ সুরটির মধ্যে ছিল প্রেমের মর্মস্পর্শী বাণী। চিরন্তন প্রেমিকার মধ্য দিয়ে গ্রামবাংলার শ্রীময়ী দুর্গার প্রতিমূর্তিটি অপূর্ব রূপে ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসিক –

"তুমার সিঁথার সিঁদুর দামিনী চৈখের কাজল যামিনী
কানফুলটি কামিনী করিছে ঝলমল
বঁধু, আর কী দিঁয়ে সাজাব তুমাকে – সিঁদুরে-কাজলে টলমল।"[৪]

- উপন্যাসিকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ পুরুলিয়ার আঞ্চলিক গন্ধ মেশানো এই গানটি অনবদ্য। এই একটি ঝুমুরই পাল্টে দিলো ভাদুরির জীবনকে। এক অলৌকিক মোহিনীশক্তি তাকে করলো ঘর ছাড়া। তাকে বাধ্য করেছিল চিরাচরিত গ্রামীণ

দমন-পীড়নের দাম্পত্য জীবনকে ছেড়ে বহির্মুখী হতে। তার মনে হয়েছিল বিবাহ একটি সামাজিক ছলনা মাত্র। শ্রীকান্তের সঙ্গে সে লিপ্ত হয় যৌনসঙ্গমে। যে যৌনসুখ তার স্বামী দিতে অপারগ ছিল, সেই সুখ সে লাভ করেছে শ্রীকান্তের কাছ থেকে। শ্রীকান্তের ঔরসে ভাদুরি জন্ম দেয় ছেলে ভভ ও মেয়ে চম্পীর। পূর্ণ হয় তার মাতৃত্বের স্বাদ। আদালত সবকিছু জানতে পেরেও নিশ্চল ছিল। কারণ গ্রামজুড়ে যদি তার যৌন অক্ষমতার কথা চাউর হয়ে যায় তাহলে সে মুখ দেখাতে পারবে না। তাই সে সবকিছু জেনেও কোন প্রতিবাদ করেনি। ভাদুরি এখানে ক্ষান্ত হয়নি। সে ছলচাতুরির দ্বারা মহিন্দারদের বাদ দিয়ে স্বামীকে রাজি করিয়ে নেয় শ্রীকান্তকে মুনিষ হিসেবে নিযুক্ত করতে। এরপর নিজের ঘরে অবাধে চলতে থাকে তাদের যৌন মিলনের আসর। মানুষের অপরিণত যৌন আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসিক সৈকত রক্ষিত এখানে সামাজিক বন্ধনের একটি জটিল চিত্র অঙ্কন করেছেন।

ভাদুরি জীবন এই অবৈধ প্রণয় নিয়ে বেশ ভালই চলছিল। কিন্তু বাধ সাধে পুত্র ভভর বয়স যখন পাঁচ বছর হয় সে সময় থেকে। সে মায়ের আর শ্রীকান্তের মেলামেশার ব্যাপারে বুঝতে পারতো। তাই সে মাঝে মাঝে মাকে হুমকি দিত বাবাকে বলে দেওয়ার। কিন্তু কে জানত তার এই সাহসিকতার জন্য তাকে প্রাণ দিতে হবে নিজের মায়ের হাতেই। মাঝে মাঝে ভাদুরি মারধর করতো ছেলে ভভকে। তখন ভভর সমস্ত রাগ পড়ত বলগা শ্রীকান্তের উপর। কারণ তার ছোট্ট হৃদয় অনুভব করেছিল শ্রীকান্তই সমস্ত নষ্টের মূল। সে আসার পর থেকেই তার মায়ের এমন পরিবর্তন। জননী যৌন সুখের জন্য এতটাই মরিয়া হয়েছিল যে, ছেলেকে চিলেকোঠায় বন্দী করে রাখতেও কুণ্ঠিত হয়নি। কিন্তু একদিন ভভ দরজার ফাঁক দিয়ে দেখে ফেলে তার মা আর শ্রীকান্তের যৌন লালসার দৃশ্যঁ। তার আক্রোশের বহিঃপ্রকাশকে উপন্যাসিক চমৎকার ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন –

> "প্রবল আক্রোশ নিয়ে লাথি মেরে, কখনো শরীরে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে ফেলতে চেষ্টা করে নড়বড়ে কপাটটি। বলে, খুল কপাট এ শিকাইন্তা! কপাট খুল নাই ত হামি বলে দিব বাবাকে! হামি আজ বলবই।"[৫]

ভভর শিশুসুলভ এই প্রতিবাদই জীবনে কাল হয়ে দাঁড়ায়। ভাদুরি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছেলের গলা টিপে ধরে তার প্রাণ কেড়ে নেয়। চেতনা ফিরে এলে সে আকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে বলেছে–

> "অ মা গ! হামি ই কী করলি! হামার ভভ ব্যাটা য্যা রা-সা কুছুই কাড়ছে নাই গ! –এ শিকাইন্তা-"[৬]

শ্রীকান্ত কান্নার শব্দ পেয়ে বাইরে এসে দেখে ভাদুরি ভভর শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে পাগলের মত ঝাঁকুনি দিয়ে নাগাড়ে বলে চলেছে–

> "রা কাড় ব্যাটা! রা কাড়! হামি আর নাই তকে মারব! হামার ভভ ব্যাটাট রে..."[৭]

এখানে উপন্যাসিক যৌনসুখ বঞ্চিতা নারীর মনস্তত্ত্বের কুটিল রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন অনবদ্য আঙ্গিকে।

পরবর্তী পর্যায়ের ঘটনা আরও জটিল পথে অগ্রসর হয়। পুত্র হত্যাকারী মা বাড়ি ছেড়ে প্রেমিক শ্রীকান্তকে নিয়ে পালিয়ে যায়। আর এখানেই শুরু হয় ভাদুরির জীবনের করুণ পরিণতির দিক। সময় যত অতিবাহিত হয়েছে সে দেখতে পেয়েছে শ্রীকান্তের কুৎসিত চেহারা। শ্রীকান্ত অর্থের লোভে তাকে পরিণত করেছে ঝুমুরের নাচনিতে। এখানে উপন্যাসিক ঝুমুর দলের নাচনিদের দুঃখ দুর্দশার একটি বস্তুনিষ্ঠ চিত্র অঙ্কন করেছেন। ভাদুরি অনুভব করে, যে নরকে এসে সে পা দিয়েছে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা ভীষণ কঠিন। পুত্র হত্যার অনুশোচনায় সে দগ্ধ হয় প্রতিনিয়ত। উপন্যাসিক ভাদুরির মনের অভিব্যক্তিটিকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন –

> "ভাদুরি এখন বুঝতে পারে, এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটি থেকে সে আর কোনোদিন মুক্তি পাবে না। বেত্রাঘাত নয়, মৃত্যুদণ্ড নয়, এটাই তার অপরাধের যথোচিত দন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে যতদিন বাঁচবে, এই দৃশ্যটি দেখে, জননী হয়ে নিরপরাধ অবোধ সন্তানকে নিজের হাতে খুন করার অনুশোচনা জীবনভর এভাবেই তাকে অন্তর্দহনে নীরবে দগ্ধ করে যাবে। শোকে দুঃখে সে পাথর হয়ে থাকবে। বাস্তবিক, ভাদুরি যেন পাথর হয়ে গেছে। পাঁচবছর পরেও সন্তানের শোক সে কিছুতে ভুলতে পারছে না এখনো সব সময় সে অন্যমনস্ক হয়ে থাকে। বিড়বিড় করে। একা একা নিজের মনে সে যেন নিজের সঙ্গে কথ বলে চলে। নাকি সে কথা বলে তার ভভর সঙ্গে?"[৮]

অনবদ্য ভাষায় উপন্যাসিক সৈকত রক্ষিত মাতৃ হৃদয়ের হাহাকারকে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা পাঠকবর্গকেও মুগ্ধ করে।

শ্রীকান্তের আচার-আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে ক্রমশ ভাদুরির মানসিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পাঁচ বছর পর এক নিশুতি রাতের অন্ধকারে ভাদুরি কন্যা চম্পীর হাত ধরে পালিয়ে আসে তার ছেড়ে যাওয়া স্বামী আদালতের গৃহে। কৃপা প্রার্থনা করে স্বামীর। সে তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করেছে পাঁচটি বছর ধরে। প্রত্যেক মুহূর্তে তার আদরের ধন যেন তাকে প্রশ্ন করেছে 'কেন মা? কেন?' কারণ এই ভভই তার আঁটকুড়ে জীবনে এসে তার বন্ধ্যা অপবাদকে ঘুচিয়েছিল। আর সামান্য কিছু সময়ের যৌন চাহিদার জন্যই তার হাত দিয়েই খুন হয়েছে কচি সন্তান। শেষপর্যন্ত স্বামী আদালত তাকে নিতে অস্বীকার করে। অবশেষে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ঠাকুরের পায়ের তলায় পড়ে গিয়ে নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছে ভাদুরি-আর এখানেই তার মাতৃসত্ত্বার জয় হয়েছে। এভাবে বঞ্চিত নারী হৃদয়ের সরল অথচ জটিল রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন উপন্যাসিক সৈকত রক্ষিত।

'ধুলা উড়ানি' (১৯৯৬) উপন্যাসে সমাজ বঞ্চিত নারীর দুর্বিষহ জীবন চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। অল্প বয়সে যৌবনের নেশায় মত্ত হয়ে ভুলসঙ্গে পড়ে একজন নারী কিভাবে নর্তকীতে পরিণত হয়ে সমাজে বসবাসকারী নারীলোলুপ পুরুষদের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হল এবং সমাজে প্রচলিত অন্ধ কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে কিভাবে ডাইনি অপবাদ নিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো তারই জীবনালেখ্য। উপন্যাসের কেন্দ্রিয় নারী চরিত্র রবন। ছোটবেলায় মা মারা যাওয়ার পর বাবাই ছিল তার একমাত্র অবলম্বন। বাবার স্নেহ তাকে কোনদিন মায়ের অনুপস্থিতির কথা অনুভব হতে দেয়নি। কিন্তু পিতাকে ছেড়ে সে যৌবনের নেশায় মাতোয়ারা হয়ে মনোহরের সাথে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। দুজনের ইচ্ছা ছিল বর্ধমান গিয়ে কামিন-মুনিষের কাজ করে নিজেদের সংসার গুছিয়ে নেবে। কিন্তু ভীতু তথা কাপুরুষ মনোহর সাঁওতাল মেয়েকে পালিয়ে নিয়ে আসার দরুন ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সঙ্গী রবনকে গৃহবন্দী করে রাখে। ঘটনাক্রমে পাড়ার মাতব্বররা এই খবর পেয়ে মনোহরের কাছ থেকে রবনকে ছিনিয়ে নিয়ে এসে নিজেদের গানের আসরের নর্তকীতে পরিণত করে। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে নিজেদের ব্যক্তিগত ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত করতেও তারা দ্বিধান্বিত হয়নি। তার এই পরিবর্তিত রূপের বর্ণনা করেছেন উপন্যাসিক এইভাবে –

> "সে গোড়ালি ঠুকে ঠুকে নাচে, শরীরে পাক খাওয়ায়, কখনো তার চোখের সামনে তাকে ঘিরে থাকা পুরুষগুলোকে উদ্দেশ্য করে সে রসের ঝুমুর গায়-তার প্রলম্বিত হাত বারবার বাড়িয়ে দেয় তাদের দিকে।"[৯]

বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাড়া এমন জীবন্ত জীবন চিত্র অঙ্কন করা কঠিন। জীবনের সুখের আশায় যে প্রেমিকের হাত ধরে সে বেরিয়ে এসেছিল জীবনের এই পরিণতির জন্য সেই প্রেমিককে সে কোনদিন ক্ষমা করতে পারেনি।

নারী সহজেই জীবন সংগ্রামে পরাজিত হতে জানেনা। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর পর রবন চুপিসারে রাতের অন্ধকারে নিজের গ্রামে ফিরে এসে মামা-মামীর আশ্রয় লাভ করে। বাপের ফেলে যাওয়া ভিটে ঘরে থাকার ব্যবস্থাও করে ফেলে। বাপের যেটুকু জমি ছিল তাতে ফসল ফলিয়ে নিজের বাকিটা জীবন কাটানোর স্বপ্ন দেখে। মামা-মামির সন্তানদের দেখাশুনা করার সূত্রে তাদের ছোটছেলে লালমৈনাকে সে নিজের সন্তান ভাবতে শুরু করে। তাকে কেন্দ্র করেই সে নিজের শূন্যময় জীবনের কথা ভুলে যেতে চায় যেকোনো মূল্যে –

> "বরঞ্চ সেই শিশুর সান্নিধ্যে এসে রবন তো ভুলতেই চেয়েছিল তার অস্ত্রের স্তবটি। ভুলতে চেয়েছিল তার অতীতকে। ঘৃণা-অবমাননা-লাঞ্ছনা দিয়ে গড়া অতীতকে। তাই লালমৈনাকে সে তার কোলে কোলে পেতে চেয়েছে। তার তৃষ্ণার্থ মুখে দিতে চেয়েছে তার নিষিদ্ধ স্তনটি।"[১০]

'নিষিদ্ধ স্তনটি' শব্দটি ব্যাবহারের মধ্য দিয়ে উপন্যাসে নারীলোলুপ সমাজের মাতব্বরদের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করেছেন। কারণ মাতৃসুলভ নারীর স্তন কখনো নিষিদ্ধ হতে পারে না। এখানে যেকোনো নারীর চিরকালীন মাতৃত্বের স্বাদ গ্রহণের যে অদমনীয় ইচ্ছা থাকে তাকেই উপন্যাসিক ফুটিয়ে তুলেছেন বাস্তবসম্মত রূপে।

লালমৈনার অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে কাহিনি আরও জটিলতা লাভ করেছে। লালমৈনা দীর্ঘদিন ধরে অসুখে ধুঁকছে। তার অসুখ কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। কবিরাজ, বৈদ্যর ওষুধের সবই ব্যর্থ হয়। শেষপর্যন্ত অন্ধ কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে গায়ের লোকের সন্দেহ গিয়ে পড়ে রবনের উপর। তারা ভাবতে শুরু করে রবন ডাইনি। আর এখান থেকেই শুরু হয় তাকে সমাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলার প্রক্রিয়া। সর্বসুখ বঞ্চিতা একজন নারী যখন নিজের কৃতকর্মের

প্রায়শ্চিত্ত করতে চায় তখন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তাকে সেই সুযোগ দেয় না। বরং তারাও তাকে ভোগ করে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চায়। রবনের ক্ষেত্রে ঠিক তেমনটাই ঘটেছিল। শেষপর্যন্ত তাকে ডাইনি প্রমাণ করে গ্রাম থেকে তথা তাঁর পৈত্রিক ভিটা থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র শুরু করে। সে গ্রামে আসার পরই গ্রামে কালো ছায়া পড়েছে, আর এই কারণেই লালমৈনা রোগগ্রস্থ। গ্রামের লোকেরা বিশ্বাস করতে শুরু করে লালমৈনাকে আদর করার ভান করে রবন তার রক্ত চুষে তাকে অসুস্থ করে ফেলেছে। গ্রামবাসীরা গুণীর নির্দেশিত পথে তাকে গ্রাম থেকে বিতড়ণের চেষ্টা শুরু করে। অবশেষে রবন নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত নিজেই করেছে। সে যেভাবে নিশুতি রাতে চৌদ্দ বছর পর নিজের পৈত্রিক ভিটার টানে গ্রামে ফিরে এসেছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই আবার রাতের অন্ধকারে হারিয়ে যায় অজানা অচেনা এক পথের অনুসন্ধানে। একদিন রাতের অন্ধকারে মামা যুধিষ্ঠিরকে উঠিয়ে বলে –

> "হামি ই-গাঁয়ের ল্যা পালাচ্ছি মামা।"[১১]

রবনের এই ইচ্ছের কথা শুনে তার মামা বিস্মিত হয় এবং জিজ্ঞেস করে সে সত্যি পালিয়ে যাচ্ছে কিনা। তখন রবন বলে–

> "হঁ মামা। ইয়ারা হামকে ইখিনে আর টেকতে দিবেক নাই।"[১২]

আঞ্চলিক ভাষায় উপন্যাসিক রবনের মনের অভিব্যক্তিকে অসাধারণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন –

> "কথাটা যেন তার ভেতরটাকে দলে মুচড়ে বেরিয়ে আসে। তার কষ্ট হয়। এই খড়িদুয়ারাকেই তো সে একদিন নিজের গ্রাম, নিজের আশ্রয় মনে করেছিল। যে-মাটিতে পা রেখে সে বলতে চেয়েছিল তার দুঃসহ অতীতকে। এখন মনে হয়, নিজের বলে কিছু হয়না। না মাটি, না মানুষ। এই মমতাহীন নিষ্ঠুর সত্য দিয়ে সে বেঁধে রাখতে চায় তার ফুঁপিয়ে ওঠা বুক। তার দুটি চোখের অশ্রুর উৎসারণকেও।"[১৩]

বস্তুত তার মাতৃসত্ত্বায় তাকে সন্তানের মঙ্গল কামনায় বিচ্ছেদ বেদনাকে সহ্য করার ক্ষমতা প্রেরণ করেছে। সে যে ডাইনি নয় এই সিদ্ধান্তই তার প্রমাণ। সে যদি ডাইনি হতো তাহলে কিছুতেই মায়া ত্যাগ করে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে যেতে পারত না। উপন্যাসিক সৈকত রক্ষিত এখানে বঞ্চিত নারীর অস্তিত্বের সংকটকে উপন্যাসের অঙ্গনে অত্যন্ত নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন রবন চরিত্রের মধ্য দিয়ে, যা অসামান্য শিল্প সার্থকতার পরিচয় বহন করে।

'বৈশম্পায়ন কহিলেন' (২০১৪) উপন্যাসটিতে উপন্যাসিক তার স্বপ্নচারিনী বিনতা নামে এক নারীর জীবন চিত্র অঙ্কন করেছেন। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল বিনতা সমাজ সংস্কার না মানা এক নারী। উপন্যাসিক উপন্যাসটির মধ্যে 'লেখকের কথা' অংশে বলেছেন–

> "বিনতা অহোরাত্র আমার স্বপ্নচারিনী ও মনোভূষন হয়ে ছিল। তার নিজস্ব চারিত্রিক ধর্ম, তার ব্যক্তিত্ব, সমাজ ও মানুষকে নিয়ে তার সংস্কারহীন স্বচ্ছ ও দ্বিধাহীন ভাবনা এবং প্রেমের ভেতর দিয়ে মানবপূজনে তার নিবিড় আবেগ – এই সবকিছু নিয়ে তার অনিবার্য আকর্ষণ আমাকে দীর্ঘদিন বিহ্বল করে রেখেছিল।"[১৪]

সমাজের নিয়মের তোয়াক্কা না করে মাতৃত্বের অনিবার্য আকাঙ্খার পাশাপাশি উপন্যাসের নায়ক মুখ শিল্পী সগর সূত্রধরের জীবনের শোকাবহ পরিণতি এবং হৃদয়ের কোমল অনুভূতির কথা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন উপন্যাসিক। একই সঙ্গে ব্যাসদেবের প্রিয় শিষ্য রোমহর্ষক পুরান পাঠক বৈশম্পায়নের প্রসঙ্গকে নতুন আদলে অঙ্কন করে মহাভারতকে নিয়ে নতুনভাবে পাঠকদের ভাবিয়ে তুলেছেন।

উপন্যাসে বিনতা সগরের বিবাহিত স্ত্রী। তার নির্দিষ্ট বয়স হওয়া সত্ত্বেও সন্তান হয়নি বলে শরীরের বাঁধুনিতে কোনরূপ ঘাটতি দেখা যায়নি। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও আজও তার শরীরের এতটুকুও উজ্জ্বলতা কমেনি, বরং তাকে দেখে মনে হয় সবেমাত্র তার যৌবন সমাগম ঘটেছে। তাদের সুখের সংসার বেশ ভালই চলছিল। সন্তান না হওয়া সত্ত্বেও তারা নিজেদের নিয়ে বেশ আনন্দিত ছিল। সগর মুখোশ তৈরির কাজ করে আর বিনতা সারাদিন সংসারের কাজ, গরু পালন, রান্না ইত্যাদিতে মশগুল থাকে। সগর অবসর সময়ে মহাভারত পাঠ করে প্রতিবেশীকে শোনায় এবং নিজের চরিত্রকে মহাভারতের চরিত্রের মতোই পরিচালিত করার চেষ্টা করেন। লেখক সগর চরিত্রকে মহাভারতের বৈশম্পয়নের চরিত্রের আদলে এবং তার আদর্শে অঙ্কন করেছেন। সাপের দেখা পেলেও সে জীবহত্যায়

অপারগ। প্রতিবেশীদের বিভিন্ন আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে বোঝাতে চায় মহাভারতের কথা। কিন্তু সামাজিক জীবনের মানুষের দ্বন্দ্ব যখন শুরু হয় তখন সামাজিক দিকেরই জয় হয়, সগরের ক্ষেত্রেও তেমনটি ঘটেছিল।

সন্তান না হওয়ার কারণে তাদের মনের মনিকোঠায় কোথাও না কোথাও একটা অতৃপ্তির বাসনা দানা বেঁধেছিল। সগর লাঘাটাই লহরিয়া বাবার আশ্রমের কথা জানতে পারে। সেখানে যদি কোন ভক্ত যায় তাহলে সে খালি হাতে ফিরে আসে না, তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। বিনতাকে সে সেখানে রেখে আসে সন্তান লাভের আকুল আর্তিতে। বিবাহের পর চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী বিনতা হঠাৎ করে বাইরের পরিবেশে এসে সংস্কারের সমস্ত বাঁধন ভেঙে দেয়। তার মানসিক পট পরিবর্তন ঘটে মুক্তাঙ্গনে আসার পর। আধুনিক সংস্কার দিয়ে সে বুঝেছিল যে একলিঙ্গ বাবার দুয়ারে অপেক্ষা করলে কখনোই তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে না, তার জন্য প্রয়োজন রক্ত-মাংসের মানুষের সঙ্গে সঙ্গম। এখানে সে আকৃষ্ট হয় শবর যুবক বভ্রু বাহনের প্রতি। পাপ-পূণ্য বোধসম্পন্ন বভ্রু মেনে নিতে না চাইলেও সে বারবার প্ররোচিত করে তাকে মিলিত হবার জন্য। সন্তান কামনায় বিনতার সংস্কারহীন অসামান্য স্পর্ধা পাঠককে বিস্ময় ও বিমুগ্ধ করে। এই প্রসঙ্গে বভ্রুর সঙ্গে তার কথপোকথনের কিছুটা অংশ তুলে ধরছি –

> "তুমার ভিৎরে অনিষ্ট চিন্তার ভূত আছে। তুমি এমন খারাপ কাজ করে লহরিয়াকে অপবিত্র করে দিবে।"[১৫]

কোনও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব না রেখে সাহসের সঙ্গে প্রত্যুত্তরে বিনতা বলে –

> "নারী পুরুষের মিলনক্রিয়া কদাপিও কুকর্ম হতে পারে না। এটাই জগতের পবিত্র সৃষ্টিকর্ম। লিঙ্গধারী পুরুষের বেশে একাজ তো লহরিয়া বাবাই সম্পন্ন করেন। ব্রতীরা তাই তো এখানে আসে। এভাবেই তারা বাবার করুণা লাভ করে। সন্তানহীনা পায় তার কোলে সন্তান আগমনের বার্তা।"[১৬]

তার এই কথায় একদিকে যেমন ভণ্ড বাবাদের প্রকৃত স্বরূপ পরিস্ফুট হয়েছে তেমনি অন্যদিকে তার এই সাহসী বার্তা পাঠককে বিস্ময়ে হতবাক করে দেয়। এই ভাবে উপন্যাসিক সন্তানহীনা নারীর আত্মিক স্বরূপের চিত্র অঙ্কন করেছেন সূক্ষ্ম তুলির টানে।

বিনতা ধর্মবিশ্বাসী, কিন্তু ধর্মান্ধ নয়। সে ভালোভাবেই জানে একলিঙ্গ শিরোমণি কখনও ভক্তের সাথে মিলিত হয় না। তাই সে যুক্তিজাল বিস্তার করে বভ্রুকে বোঝানোর চেষ্টা করে –

> "ধর্ণা দিয়ে মাথায় ফুল চাপিয়ে নারীকে গর্ভবতী করা যায় না। পৃথিবীর কোথাও কোন দেশে এত বড়ো জাগ্রত ঠাকুর নেই। কোন পীরবাবার থানও নেই। নারীর পেটে সন্তান আনতে হলে রজঃস্বলা দশায় পুরুষের সঙ্গে সঙ্গম করতে হয়। লিঙ্গ-যোনীর মহামিলনের মহামিলন ছাড়া প্রাণী কূলে নতুন জীবন আসেনা।"[১৭]

বিনতা নিজের যুক্তির জাল বিস্তার করে যখন বভ্রুকে বোঝাতে অক্ষম হয়, তখন সে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করে। সাংসারিক জীবনে সদা শান্তশিষ্ট একজন নারী মাতৃত্বের স্বাদ গ্রহণের প্রবল ইচ্ছাই যে রুদ্র মূর্তি ধারণ করতে পারে তা উপন্যাসিক অসাধারণ দক্ষতায় ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে নারী মনস্তত্ত্বের জটিল রূপটিও প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করা যায়। অবশেষে বিনতার চেষ্টা সফল হয় এবং সে বভ্রুর সন্তান ধারণে সক্ষম হয়। সমর্থ হয় মাতৃত্বের স্বাদ লাভে। সন্তান ধারনের পর সে লহরিয়া বাবার আশ্রম ত্যাগ করে আবারও গ্রামে ফিরে যায়।

নির্দিষ্ট সময়ে বিনতা পুত্র সন্তান প্রসব করে, যা কৃষ্ণের অবয়ব যুক্ত। সগরও পিতা হতে পেরে প্রচন্ড আনন্দ অনুভব করেছিল। কিন্তু পুত্র ভরত যতই বড় হতে লাগল তার গায়ের রং-এর জন্য সকলেই আড়ালে নানা কটু মন্তব্য অর্থাৎ গ্রাম্য আলাপচারিতা করতে শুরু করে। সবারই মনে সন্দেহ জাগ্রত হয় বিনতার সতীত্বের ওপর। ধীরে ধীরে সগরও বিশ্বাস করে যে ভরত তার সন্তান নয়। একটা সময় তাদের মধ্যে সম্পর্কের ফাটল ধরে। শেষপর্যন্ত সগর জানতে পারে এই সন্তানের প্রকৃত পিতা কে। সত্যকে বিনতাও আর গোপন রাখেনি। অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে বলেছে –

> "কোনো প্রতারণামূলক অলৌকিকতাকে সে বিশ্বাস করেনা। সে বিশ্বাস করে নারী পুরুষের সংগম বিনা সন্তান আসে না।"[১৮]

সন্তান কামনায় একজন নারী নিজের স্বামীর সম্মুখে এই স্বীকারোক্তি সত্যিই আমাদের অবাক করে দেয়। শুধু তাই নয় সে সগরকেও প্রশ্ন করতে ছাড়ে না –

> "কেন তাকে ধর্ণা দিয়ে লহরিয়ায় পাঠিয়েছিল সগর? কোনো অলৌকিক তপঃ প্রভাবে সে গর্ভবতী হবে বলে? এটা তার ভারত পাঠের মতিভ্রম নয়? লহরিয়া থেকে গর্ভবতী হয়ে ফিরে আসার পরেও কি সগর বোঝেনি নারীকে সন্তান সম্ভাবা করার যোগ্যতা তার নেই? বোঝেনি যে, প্রকৃত পৌরুষের অধিকারী সে নয়?"[১৯]

পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় একজন নারীর নিজের স্বামীর সামনে এই ধরনের মন্তব্য সত্যিই অভাবনীয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কোনো দম্পতি সন্তান ধারণে অক্ষম হলে দোষ যারই থাকুক না কেন সমাজ সবসময় নারীকেই অবজ্ঞা করে। বিনতা এখানে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে সমাজের প্রকৃত দিকটিকে। তার প্রশ্নের বাণে জর্জরিত শুধু সগর নয় গোটা পুরুষতান্ত্রিক সমাজ।

উপন্যাসের শেষাংশে কাহিনি ট্রাজিক পরিণতি লাভ করেছে। সমস্ত যুক্তি অগ্রাহ্য করে সগর নিজের অন্ধবিশ্বাসে অটল থেকে চুপিচুপি নিশুতি রাতের অন্ধকারে স্তনছিন্ন করে ভরতকে নিয়ে নদীর পাড়ে কলার মান্দাসে ভাসিয়ে দিয়ে প্রমাণ করেছিল যে প্রকৃত কাপুরুষ সে। সে ধর্মান্ধ, ধর্ম বিশ্বাসী নয়। যে পুরুষ মায়ের কোল খালি করে দিতে পারে সে পুরুষ সমাজের চোখে যাই হোক না কেন প্রকৃত ধার্মিক হতে পারে না। বিনতা সত্যি সাহসী, নির্ভীক, যুক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক মানসিকতার অধিকারিণী। আর এইভাবে উপন্যাসিক একজন যুক্তিবাদী নারী চরিত্রকে আমাদের সামনে হাজির করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মূলে কুঠারাঘাত করেছেন।

সৈকত রক্ষিতের পরিচয় শুধুমাত্র সাহিত্যিক হিসেবে নয়, তার সবথেকে বড় পরিচয় তিনি একজন পরিব্রাজক ও সর্বোপরি গবেষক। দশকের পর দশক ধরে আবেগ ও অনুভূতি দিয়ে অনুসন্ধান করেছেন পুরুলিয়ার অবহেলিত ও অপাংক্তেয় মানুষের জীবন চর্চার ইতিহাস। পুরুলিয়ার জনজাতির অনালোকিত জীবনচর্চার ইতিহাস পাওয়া যায় তাঁর 'সিঁদুরে কাজলে' 'ধুলা উড়ানি' ও 'বৈশম্পায়ন কহিলেন' উপন্যাসের মধ্যে। এসব উপন্যাসে উপন্যাসিক তিনজন বঞ্চিতা নারী চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক ঘাত-প্রতিঘাত, মাতৃত্বের স্বাদ গ্রহণের প্রবল আকাঙ্ক্ষা ও সর্বোপরি বীরাঙ্গনা সত্ত্বার প্রকাশ ঘটিয়েছেন অনবদ্য শিল্প সুষমায়।

Reference :

১. রক্ষিত, সৈকত, কেন লিখি, সুভাষ মুখোপাধ্যায় (সম্পাদিত), মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৃ. ২৭৮
২. রক্ষিত, সৈকত, প্লাস ওয়ান, পলমল অরূপ (সম্পাদিত), ডাভ্ পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০১৩, পৃ. ০৩
৩. রক্ষিত, সৈকত, কথাসাহিত্যিক সৈতক রক্ষিতের নিজস্ব কথন, দ্বিতীয় পর্যায় পৃ. ২৪
৪. রক্ষিত, সৈকত, সিঁদুরে কাজলে, মুক্তাক্ষর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০০২, পৃ. ১৪
৫. তদেব, পৃ. ৬৬
৬. তদেব, পৃ. ৬৬
৭. তদেব, পৃ. ৬৬
৮. তদেব, পৃ. ৮৫
৯. রক্ষিত, সৈকত, ধুলা উড়ানি, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ১৯৯৬, পৃ. ১৯
১০. তদেব, পৃ. ১১১
১১. তদেব, পৃ. ১১৩
১২. তদেব, পৃ. ১১৩
১৩. তদেব, পৃ. ১১৩

১৪. রক্ষিত, সৈকত, বৈশম্পায়ন কহিলেন, সমান্তরাল, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৪, লেখকের কথা অংশ।

১৫. তদেব, পৃ. ১৭৩

১৬. তদেব, পৃ. ১৭৩

১৭. তদেব, পৃ. ১৭৩

১৮. তদেব, পৃ. ২২৩

১৯. তদেব, পৃ. ২২৪